Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-I, published on January 2023, Page No. 230 –237
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

প্রতিবেদনে নারী নারীর প্রতিবেদন

আশোক দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর
ইমেইল : ashokdasau@gmail.com

Keyword
প্রতিবেদন, রাসসুন্দরী, পুনঃপাঠ, নির্মাণ ভাবনা, ক্রমোউন্মোচন, প্রতিকূলতা, আধিপত্যবাদ, উপস্থাপন, পিতৃতন্ত্র, শিল্প নির্মাণ, নারী শরীর, সামন্ততান্ত্রিক।

Abstract
নারীবাদী পাঠে নারীর অবস্থান কত ভাবেই না হয়ে ওঠে, সাধারণ প্রতিবেদনের সংগে নারীর প্রতিবেদনের ফারাক কতটুকু তা-ই বুঝে নিতে হয় নারীর আখ্যানে। আমরা পড়ুয়া হিসেবে যতটুকু পাঠ করিনা কেন, পাঠান্তর গত পাঠ পরম্পরায় নারী ভাবনার ভিন্ন রূপ উপস্থাপিত হয় নারীর প্রতিবেদনে। অন্তত, পাঠক হিসেবে পড়তে গিয়ে এই অনুভবে পৌঁছাই। পুরুষ মানুষের প্রতিবেদনের সাথে নারীর প্রতিবেদনের পাঠ, জীবন অভিজ্ঞতার কতই যে খুঁটিনাটি উপস্থাপিত হয় তার-ই আলোকপাত রয়েছে এই নিবন্ধের প্রতিবেদনে। লেখিকা একজন নারী হয়েও মেয়ে মানুষের জগৎ ও বীক্ষণকে কত ভাবেই যে দেখেছেন; নারীর কতই যে না বলা কথাকে দ্বিধাহীন ভাবে উপস্থাপন করেছেন, এই নিবন্ধে তার-ই এক ভিন্ন পাঠের প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

Discussion
> "মেয়েদের কথা মেয়েরাই সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারেন, বলতে পারেন। অন্য দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এর বিস্তর প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে। আমাদের এই আধা সামন্ততান্ত্রিক আধা - পুঁজিবাদী দেশে ছেলেদের কর্তৃত্ব তর্কাতীত সত্য ছিল এই সেদিন পর্যন্ত। মেয়েদের হয়ে ছেলেরাই কথা বলে এসেছে চিরকাল। নারী মুক্তির ভাবনা, আন্দোলন, সংগ্রাম : সব কিছুতে অন্তত সূচনা - পর্বে পুরুষেরা অগ্রণী।"[১]

নারীচেতনাবাদী সমালোচক তথা 'নারীবীক্ষা : নারী - পাঠকৃতি' প্রবন্ধের লেখক অত্যন্ত তাঁর মত এভাবেই ব্যক্ত করেন। আজ নারীবাদী পাঠে — নারী সমালোচনা মূলক সাহিত্যের আলোচনায়— নারীর প্রকৃত অবস্থান কী, এই সমাজে, তারা তাৎপর্যই বা কী এবং কতটুকইবা তার উত্তরণের সমস্যা এনিয়ে নানান প্রশ্ন উপস্থাপিত হচ্ছে। নতুন নতুন প্রতিবেদন পেশ করা হচ্ছে, তবুও ভাবনার কোনো ইতিরেখা দেখা যায়নি। তবে অনড় অভ্যাসের যে অচলায়তন তা থেকে দু তিনটে টুকরো পাথর খসে পড়লেও অহংকারের ধবজা আজও কোথাও না কোথাও দাঁড়িয়ে আছে। তাই দেখা যাচ্ছে পিতৃতন্ত্রের প্রতাপ নারীর শরীর নারীর ভাষা, মননে ও চিন্তনে আধিপত্যবাদী কৌশলের নিবিড় ছায়া

বিরাজমান। তবে নারীমন যে তা খুব সহজে মেনে নিয়েছে তা কিন্তু নয়; ফলে কোথাও না কোথাও প্রতিবাদের আভাষ কিংবা প্রতিরোধ লক্ষ করা যাচ্ছে। যা থেকে আজ নারীবাদী ভাবনার বিকাশ ও বিস্তার প্রতিফলিত হচ্ছে।

রাসসুন্দরীর আত্মজীবনী মূলক কাহিনি 'আমার জীবন'। নিজের ব্যক্তিগত কাহিনি লেখার ছলে লেখিকা, কতটুকু সমসাময়িক হয়ে উঠতে পেরেছিলেন— নিবিড় পাঠে তাই যেন আমরা প্রত্যক্ষ করি। ব্যক্তি রাসসুন্দরীর লেখায় কেবলই যে ব্যক্তিক ভাবনা ও ইচ্ছার প্রকাশ, তা কিন্তু নয়, বরং সমকালীন ভাবনার নিরিখে লেখিকার নিরপেক্ষ মন ও ভাবনা বারবার নাড়া দিয়ে গেছে। নিছক ভাবনার ছলে কেবল নিজের ইচ্ছাকেই রাসসুন্দরী নিয়মিত ভাবে লিখে যাননি। বরং লেখার ছলে গভীর দৃষ্টিভঙ্গিকেও লেখিকা নিয়মিত ভাবে রূপায়িত করেছেন। প্রত্যেক মানুষেরই জীবন অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। তারই নিজস্ব অভিজ্ঞতার উপাদান উঠে আসে সমাজ ইতিহাসের হাত ধরে। সমকালীন সমাজ - সংস্কৃতি সম্পর্কে ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির উপলব্ধি উঠে আসে তারই চোখ দিয়ে। আর সেই মানুষটি যদি নারী হন, তাহলে পাঠক মাত্রেই আমরা কমবেশি কৌতূহলী হয়ে উঠি। রাসসুন্দরী এমনি একজন লেখিকা যার আত্মজীবনী আমাদেরকে শুধু ভাবিয়ে রাখেনি, বরং অজানা অনেক কৌতূহলকে আজও জাগ্রত রেখেছে।

রাসসুন্দরীর জন্ম ১৮০৯ খ্রীঃ। এক অর্থে সংস্কার আন্দোলনের অনেক পূর্ববর্তী মহিলা। তবুও সবদিনই তিনি নিজের মনপ্রাণটিকে উন্মুক্ত করে রেখেছিলেন অন্যের জন্যে। পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ শৈশব থেকেই লক্ষিত হয়। কলকাতায় তখন মেয়েদের জন্য স্কুল খোলার আয়োজন চললেও সে শিক্ষা আদায়ের জন্য আগ্রহ কিংবা স্ব - ইচ্ছা তেমন করে। লক্ষিত হয়নি। কেননা পুরুষ শাসিত সমাজ সে সময় ঐ উন্মুক্ত পরিসরকে তেমন ভাবে প্রশ্রয় দেয়নি। ফলে মেয়েদের স্বাধীন ইচ্ছার আকাশ অনেকটাই রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। রাসসুন্দরী দুচোখ ভরে সে বিষয়টিও লক্ষ করেছেন। আত্মজীবনী লেখার ছলে সামাজিক ঐ অসামঞ্জস্য বিধির প্রতিও লেখিকার ক্ষোভ ও যন্ত্রণা প্রতিনিয়তই যেন ঝরে পড়েছে। নিজের ইচ্ছা যে অনেকটাই সামাজিক রীতি রেওয়াজের বাইরে নয়— তাও রাসসুন্দরী খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন। লেখিকা উল্লেখ করেছেন— মিশনারীদের উদ্যোগে পোতাজিয়ায় বাংলা মাধ্যমে ছেলেদের জন্য একটি পাঠশালা স্থাপিত হয়েছে। রাসসুন্দরীর পৈতৃক বাড়িতেই ছিল সেই পাঠশালা। তবে সমকালীন সামাজিক রীতিরেওয়াজ মেনে তাকেও অন্যান্য মেয়েদের মতই চলতে হতো। স্কুলগৃহে মেয়েদের প্রবেশের অধিকার ছিল নিষিদ্ধ। লেখিকা সেকথা জানিয়েছেন এভাবে :

> "তখন সে একদিন ছিল, এখনকার মত ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখিত না। বাঙ্গালা স্কুল আমাদের বাটিতেই ছিল। আমাদের গ্রামের সকল ছেলে আমাদের বাটিতেই লেখাপড়া করিত।"[২]

সামাজিক এই অসামঞ্জস্য রীতিরেওয়াজের প্রতি রাসসুন্দরী কোনদিনই খুশি হননি। যদিও মুখ থেকে এই প্রথার প্রতি কোনদিনই কিছু বলে উঠতে পারেননি। কারণ সামাজিক সংযম ও সম্ভ্রমের প্রতি সম্মান জানানোকেও লেখিকা কর্তব্য বলে মানতেন। তাছাড়া একটু ভীতু প্রকৃতির মহিলা ছিলেন বলেই অনেককিছু বলার ইচ্ছা থাকলেও তিনি নিজের মধ্যে নিজেকেই রুদ্ধ করে রাখতেন। লেখিকা উল্লেখ করেছেন বাড়ির পাঠশালায় যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন অনেক পরে। গুরুজনদের আদেশের জন্য তাঁকে দীর্ঘসময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল। অবশ্য সেই আদেশ যতুটুকু লেখাপড়া শেখার জন্য, তার থেকে অনেক বেশি ছিল নিজেদের কাজকর্ম লেখার জন্য। সামাজিক সুন্দরতাকে প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে লেখিকা লক্ষ করেছেন— তাকে পুরোটা দিনই বাড়ির বাইরে ঘাগরা ও উড়ানী পড়িয়ে ভালোভাবে সাজিয়ে রাখা হত, মধ্যহ্নে স্নান ও আহার সম্পূর্ণ করে তাকে পুনরায় মেমে সাবেব শিক্ষিকার কাছে বসিয়ে রাখা হত, পরবর্তীতে তাকে সন্ধ্যার পূর্বে বারিতে নিয়ে আসা হত। রামসুন্দরী খুব সুন্দর ভাবে লক্ষ করেছেন তার পরিধেয় সাজ সজ্জায় পরিবারবর্গের যতটুকু উদারতা ও সম্মান প্রদর্শিত হত— ঠিক তার টুকরো অংশও পড়াশুনার প্রতি ছিলনা। লেখিকার পরিবার বর্গ যে তার লেখাপড়ার প্রতি কোনো অগ্রণীভূমিকা নিতে পারেননি তাও খুব সহজভাবে তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। তবে সামাজিক কঠোরতার মধ্যে মেয়েদের অবস্থান যে কত যন্ত্রণাদায়ক তা তিনি যেমন মনেপ্রাণে জানতেন অন্যদিকে এর বিরুদ্ধে মুখখোলা যে একটা সামাজিক অপরাধ তা ও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। ফলে তার জন্য কাউকেই তিনি দোষারোপও করেননি। বরং নিজেকে কপালমন্দ এবং অভাগিনী রূপে স্বীকার করে

নিয়েছেন। পাঠশালায় ছেলেদের লেখাপড়ার অভ্যাস তিনি দুচোখ ভরে প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু নিজেকে এর মধ্যে শারিক করতে পারেননি। লেখিকা জানিয়েছেন :

> "তখন ছেলেরা ক খ চৌত্রিশ অক্ষর মাটিতে লিখিত, পরে এক নড়ি হাতে লইয়া ঐ সকল লেখা উচ্চৈঃস্বরে পড়িত।"[৩]

মূলত অন্যের মুখের উচ্চারণ শুনে শুনে রাসসুন্দরী সকলের অজান্তেই অনেকটা আয়ত্ত করতে শিখেছিলেন। যদিও দীর্ঘদিন তা নিজের কাছে গোপনই রেখেছিলেন। কাউকে বলার প্রয়োজনও তেমন করে বোধ করেননি। আর এভাবেই রাসসুন্দরী ক্রমান্বয়ে নিজের সঙ্গে নিজের দ্বিরালাপের সংযোগ গড়ে তুলে সকলের মধ্যে থেকেও হয়ে গিয়েছিলেন আলাদা। অক্ষর জ্ঞান এবং লেখাপড়ার প্রতি অভ্যাস মূলত তার এভাবেই গড়ে ওঠে। যদিও পরবর্তীতে নিজের ছেলের ইচ্ছাও আগ্রহে অনুশীলনের কথা লেখিকা বারবার উল্লেখ করলেও- পুত্র ছিল নিছক উপলক্ষ মাত্র। বস্তুত, নিজের একান্ত ও আগ্রহকেই রাসসুন্দরীর হয়ে ওঠার বিকাশকে ধরে নেওয়া যায়। 'চৈতন্য ভাগবত' পড়ার আগ্রহকে রাসসুন্দর ঈশ্বরের দয়া এবং কৃপা বলে মত দিলেও তা ছিল লেখিকার একান্ত ইচ্ছারই ফসল।
'লেখাপড়া শিখিয়া পুঁথি পড়িব' —এই বাসনা ছিল রাসসুন্দরীর একান্ত, কিন্তু উনিশ শতকের সূচনা পর্বে মেয়েদের সাধ থাকলেও সেরকম কোনো সাধ্য ছিলনা। ছিলনা কোনো অধিকার। মূলত রক্ষণশীল সমাজের ভূমিকা ও বিরোধিতাই ছিল প্রথম অন্তরায়। রাসসুন্দরী সাক্ষের এই অসামঞ্জস্যতাকে মানতে পারেননি, তাই তিনি জানিয়েছেন এরকম কথা :

> "তখনকার লোকে বলিত, বুঝি কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিতে পাই, এখন বুঝি মেয়েছেলেও পুরুষের কাজ করিবেক। এতকাল ইহা ছিলনা, একালে হইয়াছে। এখন মাগের নামডাক, মিনসে জড়ভরত, আমাদের কালে এত আপদ ছিলনা। এখন মেয়ে রাজার কাল হইয়াছে। দিনে দিনে বা আর কত দেখিব। এখন যেমত হইয়াছে। ইহাতে আবার ভদ্রলোকের জাতি থাকিবেনা। এখন বুঝি সকল মাগীরা একত্র হইয়া লেখাপড়া শিখিবে।"[৪]

প্রতিবেদন ধর্মী রচনায়- সমাজের প্রতিফলন থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই লেখিকার দৃষ্টিতে মুখ্যত নারীবাদী ভাবনারই প্রতিফলন ফুটে উঠেছে। আধুনিকতার সূচনা লগ্নে লেখিকার মন ও মানসিকতায় যে ভাবনার প্রকাশ ও বিস্ফোরণ প্রতিধ্বনিত হয়— তা ব্যক্তির হলেও আনেকটা সমকালের তথা সমসময়ের। নিজের আত্মজীবনীতে কেবল যে ব্যথিত মনের প্রকাশ ঘটিয়েছেন তা নয়। বরং অনেক বাঁধা ও বিপত্তিকে টপকে গিয়ে লেখিকা নিজেকে যে ভাবে প্রমাণ করেছিলেন— তা একান্তই নিজের ইচ্ছা ও আগ্রহের গুণেই প্রতিফলিত হয়েছে। লেখিকার দৈনদিন সমকালীন জীবন নিতান্তই সহজ সরল ছিলনা। প্রতিনিয়ত তাঁকে প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে সামনের দিকেই এগোতে হয়েছিল। শিক্ষার আলো মহিলারা গ্রহণ করুন সেরকম মন মানসিকতার অভাব ছিল সমকালীন মেয়েদের হাতে কাগজের টুকরো দেখলে অনেকেই অসন্তোষ প্রকাশ করতেন; রাসসুন্দরী লেখায় তারই প্রতিফলন আছে। তবে সামাজিক অবস্থার এই নিদারুণ ছবি প্রত্যক্ষ ব্যধি হলেও, উনিশ শতকের মেয়েদের অবস্থান দেখে অনেকটাই লেখিকা আহ্লাদিত হয়ে। উঠেছেন :

> "বাস্তবিক মেয়েছেলের হাতে কাগজ দেখিলে সেটি ভারি বিরুদ্ধ কর্ম জ্ঞান করিয়া, বৃদ্ধ ঠাকুরানীরা অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন ...এখনকার মেয়েছেলে গুলা যে নিষ্কণ্ঠকে স্বাধীনতায় আছে তাহা দেখিয়াও মন সন্তুষ্ট হয়। এখন যাহার একটি মেয়েছেলে আছে, সে কত যত্ন করিয়া লেখাপড়া শিখায়।"[৫]

উনিশ শতকের ছেলেমেয়েদেরকে প্রত্যক্ষ করে রাসসুন্দরী ঈর্ষান্বিত হননি, বরং খুশিষ্ট ব্যক্ত করেছেন। যদিও খুব কম সংখ্যক মেয়েদের ভাগ্যে শিক্ষার আলো এসে পৌঁছচ্ছে এবং তাতে যে সমাজে মানসিকতার পরিবর্তন ঘটবে তাতেও আশা ব্যক্ত করেছেন। বস্তুত, রাসসুন্দরী লিখেছেন আত্মজীবনী। যার মধ্যদিয়ে নিজের আত্ম কথা তথা নিজের ব্যক্তিগত কথাকে প্রকাশ করারই কথা ছিল। কিন্তু খুব সুচারু ভাবে লেখিকা তার আত্মজীবনীতে কেবলই নিজের নামকীর্তন করেননি; সামাজিক দায়ভার এবং সমকালীন সময়ের বিশেষত নারীমানসকে খুব সুচারুভাবে উপস্থাপন করতে গিয়ে লেখিকা তাঁর আত্মজীবনীতে যেভাবে কলম ধরেছেন তা সত্যিকার অর্থেই প্রশংসিত। মাত্র বারো বৎসর

বয়সে বিয়ে হয়ে যায় রাসসুন্দরীর। বিয়ে সম্পর্কে সেরকম কোনো ধারণাই গড়ে উঠেনি তার। বিবাহের বিবরণ ও তার রীতি রেওয়াজ সম্পর্কে তাকে কেউ কোন দিন বুঝিয়েও বলেনি। ফলে বিবাহ কিংবা শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে সেরকম কোন ধারণা তার কোনদিনই ছিলনা। বিবাহোত্তর জীবন, সংসার - স্বামী - সবগুলোই ছিল তার কাছে স্বপ্নের মতো। যদিও একান্নবর্তী পরিবারের, স্বামী শাশুড়ীর স্নেহ ও যত্ন তিনি সবকিছুই লাভ করেছিলেন। শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার প্রাক্‌মুহূর্ত তার বড়ই অসহনীয় বলে মনে হত। নিজের মনের করুণ অবস্থার কথা বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখিকা জানিয়েছেন এমন কথা :

> "যখন দুর্গোৎসবে কি শ্যামাপূজায় পাঁঠা বলি দিতে লইয়া যায় সে সময়ে সেই পাঁঠা যেমন প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া হতজ্ঞান হইয়া মা মা, মা বলিয়া ডাকিতে থাকে আমার মনের ভাবও ঠিক সেই প্রকার হইয়াছিল।"[৬]

অল্প বয়সে মেয়ে থেকে স্ত্রী হওয়ার ফলে রাসসুন্দরীকে অনেক অসুবিধারই সম্মুখীন হতে হয়েছে। আজন্ম কাল যে পরিবেশ ও পরিবারে মেয়েরা লালিত হয় বিয়ের পরবর্তী স্তরে তা অনেকটাই দূরবর্তী হয়ে যায়। মনের যন্ত্রণাকে মনের মধ্যেই লুকিয়ে রাখতে হয়। স্বামীর ঘরের স্বজনেরাই আপন হয়ে ওঠেন। সামাজিক পালা বদলের এই সময়টিকে আত্মস্থ করে নিতেও রাসসুন্দরীর দীর্ঘ সময় লেগেছে। শ্বশুরবাড়ির যথেষ্ট বিধিনিষেধের মধ্যে চলাফেরার অভিজ্ঞতা রাসসুন্দরীর জীবনেও ঘটেছে। তবে কোনোদিনই চলনে ও বলনে অবাধ্য আচরণ করেননি। অতীত দিনের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে লেখিকা সেদিনকার কথা উল্লেখ করেছেন :

> "বিশেষত তখন ছেলেমেয়ের এই প্রকার নিয়ম ছিল, যে বৌ হইবে সে হাতখানেক ঘোমটা দিয়া ঘরের মধ্যে কাজ করিবে, আর কাহারও সঙ্গে কথা কহিবে না, তা হইলেই ভাল বৌ হইল। সেখানে এখনকার মতো চিকণ কাপড় ছিলনা, মোটা কাপড় ছিল। আমি সেই কাপড় পরিয়া বুক পর্যন্ত ঘোমটা দিয়া সকল কাজ করিতাম। ...সে কাপড়ের মধ্য হইতে বাহিরে দৃষ্টি হইত না। যেন কলুর বলদের মত দুইটি চক্ষু ঢাকা থাকিত। আপনার পায়ের পাতা ভিন্ন অন্য কোন দিকে দৃষ্টি চলিত না।"[৭]

প্রতিবাদহীন এক প্রতিবাদিনীর মনের ক্ষোভ আমরা লেখিকার রচনায় প্রত্যক্ষ করি। মনের যন্ত্রণাকে মনের মধ্যে রেখেই রাসসুন্দরী এগিয়ে গিয়েছিলেন। সমকালীনতাকে সমকালের মত শ্রদ্ধা ও সম্মান করা যেমন তার স্বভাবে ছিল, অন্যদিকে সমকালের ক্ষত বিক্ষত যন্ত্রণাবিদ্ধ দিনের প্রতিও ছিল তার সজাগ দৃষ্টি। তিনি জানতেন— এক একটি মেয়ে কিংবা বউ হয়ে পাহাড় সম অচলায়তনের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাওয়া একটুখানি কথা নয়; তবুও মন এবং মানসিকতাকে তিনি রেখেছিলেন সবার উপরে। তাই পরিবারের সকল রকমের দায়দায়িত্বকে স্বীকার করেও, একান্নবর্তী পরিবারের প্রতি যেমন কর্তব্য ও সম্মানকে তিনি পালন করেছেন — অন্যদিকে সহানুভূতির উন্মুক্ত হাত দুটিকে প্রসারিত করে রেখেছিলেন সবার জন্যে। সবথেকে বড় কথা লেখিকার ব্যক্তিগত আত্মজীবনীতে কোনো কিছুকেই যেন গোপন করে রেখে যেতে চাননি। পুঁথিটিতে খোলা মনের প্রকাশ যেমন সকল পাঠককেই সন্তুষ্টি দান করে অন্যদিকে সহজ কথাকে আরো কত সহজ ভাবে প্রকাশিত করা যায় তারই অন্য আরেক দিককে পাঠক আবিষ্কার করে চলে তাঁর লেখায়, না- নিছক নারী হয়ে কোনো নারী সম্পর্ক ভাবুক— লেখিকার মতো যে কলম ধরেছেন তা কিন্তু নয়। বরং সবার মতো করে, সবাইকে নিয়েই যেন রাসসুন্দরীর আত্মজীবনীটি আমাদের সকলের কাছে সুন্দর হয়ে ওঠে। রাসসুন্দরীর লেখায় তারই যেন প্রকাশ বারবারই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

> "আমার প্রিয় নারী হচ্ছেন সেই নারী, যিনি স্বদেশ ও স্বকালের গভীরে পা রেখে তার চারপাশের বিষয় বাস্তবতার অন্তর্গত স্বর থেকে উত্থিত মানবিক আবেগ চৈতন্য সমূহের সপন্দন তরঙ্গ সমূহকে মনের গভীরে ধারণ করতে পারেন, আপন বিশ্বাসের জগতে স্থিত থেকে সামাজিক উত্তরণ - অকার্যকারণ সম্পর্ক সমূহকে প্রকৃতি সমাজ ও ব্যক্তি মানুষের দ্বান্দ্বিক মিথক্রিয়ার ব্যস্ত প্রেক্ষাপটে অনুধাবণে নিয়ত দায়বদ্ধ থাকেন ও এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে একটি স্বতন্ত্র ভুবন নির্মাণ করে আপন বীক্ষার স্বাতন্ত্র্যে দীপ্যমান হয়ে উঠতে পারেন।"[৪]

সমালোচকের এই মন্তব্য বড়ই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে রাসসুন্দরীর পাঠ নিতে নিতে। 'আমার জীবন' পড়তে পড়তে মনে হয় ঘরের চারদেওয়ালের মধ্যে নিজেকে সংস্কারে আবদ্ধ রাখলেও তাঁর মনপ্রাণ সমকালীন বাস্তবতার প্রতিও খুব সজাগ ও সচেতন ছিল। অন্তত তার লেখায় তারই ইঙ্গিত যথেষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আত্মজীবনী যে

শুধু আত্মকথা নয় বরং নিজের কথার বাইরেও যে অনেক বক্তব্য রয়ে যায়, থেকে যায় তারও যথেষ্ট ইঙ্গিত ও প্রমাণ আছে রাসসুন্দরীর রচনায়। সুদূর প্রান্তিকায়িত গ্রামের মহিলা হয়েও। নিজের মন প্রানটিকে কতটুকু প্রশস্ত রেখেছিলেন তা তাঁর জীবনীগ্রন্থ পড়লে সহজেই বুঝা যায়। সংস্কারে আবদ্ধ থেকেও সংস্কারে সামাজিকতা ও কর্তব্যকে পালন করেও স্বমহিমায় যে নিজে কত উজ্জ্বল ছিলেন তা তার লেখায় বারবার ধরা পড়েছে। দীর্ঘ বছরের বার বছর পেরিয়ে এসেও জীবনকাহিনি লেখার ছলে যে সত্যকাহিনি লেখিকার রচনায় ও উচ্চারণে প্রতিফলিত হয়েছে— তা আমাদের বিস্মিত করে। কোথাও একটু মাত্র মিথ্যার আবরণে না ঘিরে নিজেকে যে ভাবে উপস্থাপিত করেছেন তা আমাদের প্রকৃত অর্থেই আমাদের ভাবিয়ে রাখে।

> "উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশিত হল বাংলা সাহিত্যে প্রথম আত্মজীবনী। নতুন ভাবনার জোয়ার, আধুনিক চেতনার ঢেউ যেখানে পৌঁছায়নি, বাংলার সেই অনালোকিত অন্তঃপুর থেকেই সৃষ্টি হলো আমার জীবন রচয়িতা বাংলার দূর প্রত্যন্ত গ্রামে এক গৃহবধু রাসসুন্দরী। সে সময় শিক্ষিত কৃতী পুরুষেরা তাঁদের সময়, সমকালের সংগে নবলব্ধ নবভাবনার সংঘাত, তার প্রতিক্রিয়া তুলে ধরতে চেয়েছিলেন আত্মকথা স্মৃতিকথার মাধ্যমে। পুরুষদের আগ্রহ ও সাহায্যে কৃতী পুরুষদের স্ত্রী বা আত্মীয়ারাও অনেকেই লিখেছেন, লিখতে চেয়েছেন সময়ের প্রেক্ষাপটে নিজের জীবনের কথা। ...তবে তাঁদের মধ্যে ছিলেন না আমাদের আলোচিত রাসসুন্দরী তথাকথিত সাফল্যের চরমসীমা তিনি স্পর্শ করতে পারেননি। কিন্তু সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যদিয়ে তিনি বিকশিত হয়ে উঠতে চেয়েছেন। পৌঁছাতে চেয়েছেন পরম কাঙ্খিত শিক্ষার উজ্জ্বল আলোকবৃত্তে। রাসসুন্দরীর হয়ে ওঠার ইতিহাসই তাঁর আত্মকথা 'আমার জীবন।"[৯]

সম্পাদকের কথা অংশে একটি বক্তব্য যখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে তখন রাসসুন্দরীর 'আমার জীবন' পাঠ আমাদের কাছে নতুন প্রেরণার উদ্যম নিয়ে আসে। কেননা আজ যখন বাইরে - ঘরে মেয়ে এবং নারীদের জীবন এক প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেছে, সে সময় রাসসুন্দরী স্বাভাবিকভাবে আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন আমাদের কাছে। লেখিকার যে প্রতিবেদন গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে তিনি তাঁর সাংসারিক অবস্থায়, স্বামী - শাশুড়ী আত্মীয় পরিজনের সকলের স্নেহ যত্নে ছিলেন অত্যন্ত সন্তুষ্ট। প্রত্যেকেরই সম্মান ও ভালোবাসা তাঁর ভাগ্যে ঘটেছিল। পারিবারিক জীবনে কারোর কাছেই দুঃখ জনক ব্যবহার পাননি। তাই শত বিপর্যয় ও বিড়ম্বনাকে সয়ে নিয়েও লেখিকা নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেছেন। যদিও সাংসারিক জীবনে কোনো কিছুর অভাব হয়নি তাঁর। রাসসুন্দরীর জীবনে সুখদুঃখের অংশীদার সকল কিছুই যেন তাকে ছুঁয়ে গেছে। মা হওয়ার আকাঙ্খা এবং মাতৃত্বের ব্যথার কথা খুব অবলীলায় লেখিকা সযত্নে বলে গেছেন তার লেখায়। আঠার থেকে একচল্লিশ বছর পর্যন্ত তাঁকে বারোজন সন্তানের জন্ম দিতে হয়েছে। এই জন্ম দানের প্রসবকালীন ব্যথা ও বেদনা — যেমন তাঁর লেখায় পাই, অন্যদিকে এসবগুলোকে নিয়েই একান্নবর্তী পরিবারের দায়ভারকে লেখিকা কর্তব্য বলে মানতেন। সংসারে ছেলে পিলে থেকে শুরু করে ঘরের সমস্ত কর্মযজ্ঞকে সুচারু ভাবে করতে গিয়ে কাজের ভিড়ে দিনের পর দিন তাকে না খেয়েই কাটাতে হয়েছে। তাঁর জীবনে এমনও দীর্ঘ সময় গেছে যেখানে তাঁর নিজের প্রতি তাকাবার কোনো সুযোগই ছিল না। যদিও সেকথা কেউ কোনোদিন জানতেও পারেনি। আর তার জন্য তাঁর কোনো দুঃখবোধও হয়নি।

> "আমরা যেমন দশ বারটি সন্তান হইয়াছিল, তেমনি যদি উহাদিগের চরিত্র মন্দ হইত এবং সকলে মন্দ বলিত, তাহা হইলে আমার ভারি কষ্ট ভোগ করিতে হইত। ঈশ্বরেচ্ছায় আমার সে সকল কষ্ট ভোগ করিতে হয় না, বরং লোকের মুখে উহাদের প্রশংসা শুনিয়া এবং সত্য ব্যবহার দেখিয়া মন আরও প্রফুল্লই হয়। ...লোকে বলে সংসার সমুদ্র। সে সমুদ্রই বটে, কিন্তু সংসারের সংগে সমুদ্রের তুলনা করিয়া দেখিলে, সংসার তরঙ্গ হইতে সমুদ্রের তরঙ্গ বোধহয় বড় জয়ী হইতে পারে না, সময়ে সময়ে তুল্যই হয়। সে যাহা হউক, সেই সমুদ্র লহরী মধ্যে পরমেশ্বর আমাকে স্বচ্ছন্দচিত্তে মহাসুখে রাখিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে আমার যদিও অত্যন্ত বিবাদ ঘটিয়াছিল, তথাপি আমার মনের এত প্রফুল্ল ভাবছিল যে ঐ মহাবিপাদে আমাকে এক কালে অবসন্ন করিতে পারে না।"[১০]

এই সেই রাসসুন্দরী। যার বক্তব্য বিষয় যেমন স্বচ্ছ অন্যদিকে দৃষ্টিভঙ্গিতে রয়ে গেছে এক আশ্চর্য স্বচ্ছতা। ভাষা ব্যবহারের যে সরলতা তা যেন লেখিকার নিজের অন্তরের অন্তস্থল থেকে উঠে এসেছে। তার জীবনী গ্রন্থটি সাধুগদ্যে লেখা হলেও গদ্যরীতিতে ধরা পড়েছে হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ততা। ভাবলে আশ্চর্যবোধ হয় যে যার জীবন কেটেছে চারদেওয়ালের মধ্যে তারতো সে অর্থে গদ্যলেখার অভ্যাস ছিলোনা, তবুও কোথাও আশ্চর্য লেখনি শক্তির অংশীদার হওয়ার সুবাদে রাসসুন্দরীর রচনায় আশ্চর্য শব্দের রকমারি পাঠক মাত্রেই অনুভব করতে পারেন। লেখিকার রচনায় সমকালীন অন্তর্জীবনের খোঁজ স্বাভাবিক ভাবেই ফুটে উঠেছে। পাঠক মাত্রেই তা আন্দাজ করতে পারেন। সংবেদনশীল ও অনুভূতিময় সতেজ ও সুখপাঠ বক্তব্যভঙ্গি রাসসুন্দরীর মধ্যে সদাজাগ্রত ছিল। কোনো ধার করা আধুনিকতার মধ্যে দিয়ে তিনি এগিয়ে যান নি। বরং নিজের হৃদয়ের অনুভূতিস্থল থেকে উঠে আসা মনের মাধুরী দিয়ে সত্যের জগতকেই তিনি তাঁর লেখায় উপস্থাপন করেছেন। রামসুন্দরীর লেখার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে উঠে এসেছে অনেকগুলো কবিতা। যদিও তার গদ্য ভাষা যেভাবে আধুনিক কবিতাগুলো সেভাবে নয়। তার বক্তব্যগুলোতে ভাষা যেভাবে শাণিত ও ধারালো হয়ে উঠে কবিতাতে সেভাব অনেকটাই কম।

রাসসুন্দরী যে সময়ে লালিত হয়েছেন সে সময় নারীবাদী ভাবনার কোনো গন্ধ বাতাস ছিল না। নারীভাবনার আলাদা জগত থেকে তিনি ছিলেন অনেক দূরবর্তী। তবুও রাসসুন্দরী চারদেওয়ালের মধ্যে রুদ্ধ থাকলেও তাঁর মন ও মানসিকতা নারীবাদী ভাবনার আলোকেই যেন প্রসারিত ও বিকশিত হয়েছে। মুখ খুলে প্রতিবাদিনীর ভূমিকা হয়ত নেননি কিন্তু মনেপ্রাণে মেয়েমানুষের দুর্দশা ও অবহেলার কথা তাকে ভাবতে হয়েছে। তাই পরবর্তী সময়ে যখন তিনি আত্মজীবনী রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন তখন তাঁর মনের আক্ষেপ ও সামাজিক সমাজ ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো আপনা থেকেই ধরা দিয়েছে। লেখিকা দু-চোখ দিয়ে যে বাস্তবকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং যে সত্যকে দেখেছিলেন তাই যেন আক্ষরিক অর্থে তার প্রতিবেদনে উপস্থাপন করেছেন। সত্যের সংগে কোনো রকম আপোসরফা করেননি। অনেক না বলা কথা নিজের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে লেখিকা আমাদের না জানালেও পারতেন— কিন্তু আত্মজীবনীতে যখন কলম ধরেছেন তখন ব্যক্তিগত সাংসারিক এবং পারিবারিক জীবনের কোনো অংশই তিনি বাদ দিয়ে যান নি। তাঁর নিজস্ব প্রতিবেদনে যেভাবে সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেছেন অন্যদিকে সামাজিক অন্যায় ও অসামঞ্জস্যের প্রতিও লেখিকার দুঃখ ও যন্ত্রণা আপনা থেকেই বর্ষিত হয়েছে। রাসসুন্দরী আসলে সমকালীন এমন একজন নারী যিনি সবকিছুর মধ্যে থেকেও সবগুলোকে টপকে যাওয়ার সংকল্প রেখেছিলেন। অত্যন্ত তার প্রতিবেদনে এরকমই একটা আভাস পাই।

> "সাহিত্যে নারী যখন প্রতিমায়িত হয়, সেই বিমূর্তায়িত উপস্থাপনার আড়ালে পড়ে যায় নারীর বাস্তব অস্তিত্ব। মধুর মিথ্যার অলংকরণে নারীর নিজস্ব সত্য ঝাপসা হয়ে যায়। ...সামাজিক অর্থনৈতিক পীড়নের পাশাপাশি লৈঙ্গিক পীড়নকে যাঁরা সমান প্রাথমিক মনে করেন তারা দেখিয়েছেন, শ্রেণীগত নির্যাতনের মতো পিতৃতন্ত্রের নিষ্ঠুর অত্যাচারও নারীকে সইতে হয় বলে তার মুক্তির সংগ্রাম একাত্তিক নয়। এই প্রক্রিয়া খুব জটিল কেননা ইতিহাসের নানা পর্যায়ে। নারী হয়ে জন্মানোর সুবাদে, সমাজের বিপুল অংশকে বিপুল অন্ধকার এবং তার দ্বারা আরোপিত দৃশ্য - অদৃশ্য অজস্র শেকল ভেঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার জন্যে কঠিন সাধনা করতে হয়েছে।"[১১]

এটা ঠিক ইতিহাসে নারীর সাধনা তিলে তিলে বিকশিত হয়ে কোথাও কোথাও বিস্ফোরিত হয়েছে। নারী নির্যাতন অগোচরে অন্ধকারে হয়ে থাকে বলে আমরা অনেকেই তার খবর রাখি না। বলা যায় অনেক ক্ষেত্রেই তাই প্রকাশিত হয় না। রাসসুন্দরী লেখনিতে তার প্রত্যক্ষ ছাপ না থাকলেও পরোক্ষভাবে সমসাময়িক ভাবনা ও বাস্তবতার ইলারা আছে। ঊনষাট বছর বয়সে যখন আত্মজীবনী লিখতে প্রয়াসী হয়েছেন তখন অনেক অতীতের কথা মনে করে দুঃখ পেয়েছেন। মেয়েদের ভাগ্যের আকাশ যে সবদিনই মেঘলা তা মেনে নিতে তার কোনো অসুবিধে না হলেও — তবে সমাজের আলো - আধারির আবহ সরিয়ে দিয়ে সবাইকেই যেন সামনের দিকে এগিয়ে আসতে হবে। সংসারের সমস্ত দায়িত্ব প্রতিপালন করেও অবসন্ন হৃদয় নিয়েও যে একটু বইয়ের পাতা উল্টোবেন তারও সময় ছিল না তাঁর। তবুও লোকচক্ষু ও সংসারের আড়ালে উঠে এসে নিজের আগ্রহ ও উদ্যামকে জাগিয়ে রেখেছিলেন বলেই হয়তো আমরা পড়তে বাধ্য হই এই লেখিকাকে। রাসসুন্দরীর প্রতিবেদনকে। কঠিন অধ্যবসায় ও মনের একান্ত আগ্রহ নিজের মতো

করে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন বলেই হয়ত উত্তর প্রজন্মের কাছে রাসসুন্দরীর ব্যক্তিগত জীবন আদর্শ স্বরূপ অনুসরণ যোগ্য। সমস্ত আত্মজীবনীতে এক অদ্ভুত বিনয় আমাদের চোখে পড়ে। কারণ রামসুন্দরী কোথাও কিছু জোর করে আরোপিত করে যাননি। বরং নিজের মনপ্রাণ দিয়ে যে সত্য ও আচরণকে উপলব্ধি করেছিলেন প্রতিবেদনে তারই প্রকাশ ঘটেছে। ঈশ্বরের প্রতি সদাজাগ্রত ও বিশ্বাসী রাসসুন্দরী - মদনগোপালের প্রতি যে আস্থা রাখতেন — জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও তার কোন বিরাম হয়নি।

বস্তুতপক্ষে, নারীর প্রতিবেদন কিংবা প্রতিবেদনের নারী এক নয়। নারীর লেখায় নারীর জগৎ কতভাবে ধরা পড়েছে তা - ই মূলত দেখার বিষয়। বাস্তবের নারী যখন সাহিত্যের নারীতে রূপান্তরিত হয়, সে সময় সমাজ - সংস্কৃতি - ইতিহাস - ভূগোল - রাজনীতি - ভাবাদর্শ ঐ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। মুলত লৈঙ্গিক আদিকল্প গুলো বিনির্মাণ না করে নারীচেতনার কোনো সক্রিয় অভিব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কেননা এর পশ্চাতে রয়েছে শৃঙ্খল মুক্তির দর্শন। রাসসুন্দরীর লেখায় মূলত শৃঙ্খল এবং তা থেকে উত্তরণের ক্ষীণ প্রয়াসকেও উত্থাপিত হতে দেখা যায়। তবুও সমালোচক অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্যের ভাষায় বলা যেতে পারে :

> "নারীচেতনা ও নারীর প্রতিবেদন একাত্তিক নয়, অজস্র ও অনেকাত্তিক। প্রতিবেদনের নারীকে ইতিমধ্যে অনেকটা পরিমাণে বিনির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। পুনঃপাঠের মধ্য দিয়ে ইদানীং যে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। পুনঃপাঠের মধ্য দিয়ে ইদানীং যে মুক্ত পরিসরের দ্যোতনা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে পুনর্নির্মিত হয়ে চলেছে, তার সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতি নান্দনিক মাত্রার সংগে অভিন্ন। সমস্ত সংশয় পেরিয়ে এবং পিতৃতন্ত্রের সম্ভাব্য ফাঁদগুলি এড়িয়ে সংবেদনশীল পুরুষেরা যখন নতুন ভুবন নির্মাণের ব্রত উদযাপনে সংগ্রামী নারী চেতনাবাদীর সংগে সংযুক্ত হবেন তখনই নারীর প্রতিবেদন এতদিনকার অভ্যাস পরম্পরা ভেঙে প্রতিবেদনের নারী প্রতিমাকে চূড়ান্তভাবে পরাভূত করতে সক্ষম হবে।" [১২]

তথ্যসুত্র :

১. ভট্টাচার্য, তপোধীর, নারীচেতনা মননে ও সাহিত্যে 'নারীবীক্ষা ও নারী পাঠকৃতি', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০৯, পৃ. ১৯
২. দেবী, রাসসুন্দরী, আমার জীবন, চিত্রিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা) প্রয়াস প্রকাশন, কলকাতা-২০০২, পৃ. ২৯
৩. তদেব, পৃ. ২৮
৪. তদেব, পৃ. ৪৩
৫. তদেব, পৃ. ৪৯
৬. তদেব, পৃ. ৩৬
৭. তদেব, পৃ. ৪২
৮. রায় চৌধুরী, সমীর, (সম্পাঃ) ইকোফেনিমিজম , 'আমার প্রিয় নারী' সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওয়া-৪৯, কলকাতা-১৯৯৭, পৃ. ১১৮
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রিতা, (সম্পাঃ) আমার জীবন, সম্পাদকের কথা, কলকাতা-২০০২, পৃ. ৪
১০. দেবী, রাসসুন্দরী, আমার জীবন, চিত্রিতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাঃ প্রয়াস প্রকাশন কলকাতা- ২০০২, পৃ. ৫৭
১১. ভট্টাচার্য, তপোধীর, প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, 'নারীচেতনাবাদ', অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, ফেব্রুয়ারি-২০০২, পৃ. ১১৫
১২. ভট্টাচার্য, তপোধীর, নারীচেতনা মননে ও সাহিত্যে, প্রতিবেদনের নারী নারীর প্রতিবেদন, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, জানুয়ারি-২০০৯, পৃ. ১০৭

সহায়ক গ্রন্থ :

১. ভট্টাচার্য সুতপা : মেয়েলি পাঠ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-২০০২
২. ভট্টাচার্য সুতপা : মেয়েদের লেখালেখি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-২০০৪
৩. ভট্টাচার্য সুতপা : মেয়েলি সংলাপ, প্যাপিরাস , কলকাতা-২০০৫
৪. মুরশিদ গোলাম : নারী প্রগতি : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা-২০০১
৫. মুরশিদ গোলাম : রাসসুন্দরী থেকে বেগম রোকেয়া, নারী প্রগতির একাশ বছর, হায়দ্রাবাদ, ১৯৯৩
৬. সেনগুপ্ত মল্লিকা : স্ত্রী লিঙ্গ নির্মাণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা -১৯৯৪, সেনগুপ্ত মল্লিকা : পুরুষ নয় পুরুষতন্ত্র, বিকাশ গ্রন্থ ভবন, কলকাতা, ২০০২
৮. হক মফিজুল : নারীপুরুষ বৈষম্য, বিশ্লেষণ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯